The Infinite
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | September 2024
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের অবদান: একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিনীতা শ্রীবাস্তব

প্রিন্সিপাল

এস ভি এন পাবলিক স্কুল, চাস, বোকারো স্টিল সিটি

কীওয়ার্ড:

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের স্বাধীনতা, বিপ্লবী, স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলার নবজাগরণ

বিমূর্ত

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আদর্শিক এবং সক্রিয় প্রতিরোধ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। 19 শতকের গোড়ার দিকে থেকে 1947 সালে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা পর্যন্ত, অঞ্চলটি বিপ্লবী কার্যকলাপ, সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে যা ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের গতিপথকে রূপ দেয়। বাংলার অবদান ছিল বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো নেতাদের অহিংস আইন অমান্য পর্যন্ত। উপরন্তু, বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পরিচয়ে পুনরুত্থান ঘটায় যা স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। এই নিবন্ধটি বিপ্লব, নেতৃত্ব এবং সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে বাংলার সমালোচনামূলক অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রূপ দিয়েছে।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন অঞ্চলের অবদান দ্বারা চিহ্নিত, প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি অনন্য দিক যোগ করে। তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র তার বিপ্লবী আন্দোলনের কারণে নয় বরং চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নেতৃত্বের কারণেও একটি বিশিষ্ট অবস্থান দখল করে আছে। এই অঞ্চলের অবদান ছিল বহুমাত্রিক,

যা রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। নীল বিদ্রোহের মতো প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণ ছিল বৃহত্তর ভারতীয় সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ এবং জটিল ইতিহাস রয়েছে যা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। , এবং ভারতের সামাজিক উন্নয়ন। দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, বাংলার ঐতিহাসিক আখ্যান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এর বিশিষ্টতার সাথে শুরু হয়। এই অঞ্চলে মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং পরবর্তীতে পাল ও সেন রাজবংশ সহ শক্তিশালী সাম্রাজ্যের আবাসস্থল ছিল, যা বাংলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পাল রাজবংশ, বিশেষ করে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এই সময়কালে এই অঞ্চলটি বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল।

মধ্যযুগের শেষের দিকে, বাংলা দিল্লি সালতানাতের শাসনাধীনে আসে, এরপর ১৪ শতকে বাংলা সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য। এটি ইসলামী সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 16 শতকের মধ্যে, বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে শোষিত হয়, যেখানে এটি একটি ধনী প্রদেশ হিসাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে, যা তার বস্ত্র, বিশেষ করে মসলিনের জন্য বিখ্যাত। এই সময়ে, বাংলা সংস্কৃতির একটি গলে যাওয়া পাত্র হয়ে ওঠে, উল্লেখযোগ্য হিন্দু, মুসলিম এবং আদিবাসী প্রভাবগুলি এর সমাজকে গঠন করে।

18 শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার আবির্ভাবের সাথে বাংলার ইতিহাসে একটি মোড় ঘুরিয়ে দেয়। 1757 সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে, যার ফলে বাংলায় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ আসে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময়কালটি বাংলার সম্পদের শোষণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার ফলে 1770 সালের কুখ্যাত বাংলার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতি এবং জনসংখ্যাকে ধ্বংস করেছিল।

19ম এবং 20 শতকের প্রথম দিকে বাংলা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। রাজা রাম মোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে বেঙ্গল রেনেসাঁ সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সংস্কার আন্দোলনে পুনরুত্থান ঘটায়। স্বদেশী আন্দোলনের মতো আন্দোলন এবং ক্ষুদিরাম বোস এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্ট বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

1947 সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, বাংলাকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ) রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, যার রাজধানী কলকাতা ছিল, স্বাধীন ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কয়েক দশক ধরে, রাজ্যটি রাজনৈতিক উত্থান, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সাংস্কৃতিক অবদান দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে তার উত্তরাধিকার অব্যাহত রেখেছে।

প্রারম্ভিক প্রতিরোধ আন্দোলন

বাংলায় রাজনৈতিক প্রতিরোধের বীজ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খুঁজে পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধ (1757) এবং বক্সারের যুদ্ধ (1764) এর পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তার শাসনকে সুসংহত করেছিল এবং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যন্ত্রের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আর্থ-সামাজিক শোষণ ব্যাপক অসন্তোষকে উস্কে দিয়েছিল, যা বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্রোহের দিকে পরিচালিত করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (1770-1820) এবং চুয়ার বিদ্রোহ (1799)। এই বিদ্রোহগুলি, যদিও স্থানীয়ভাবে, ব্রিটিশ নীতির প্রথম দিকের বিরোধিতা প্রদর্শন করে এবং ভবিষ্যতে সংগঠিত প্রতিরোধের ভিত্তি স্থাপন করে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি ছিল 1859-60 সালের নীল বিদ্রোহ, যেখানে বাঙালি কৃষকরা ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে উঠেছিল যারা তাদের শোষণমূলক চুক্তিতে বাধ্য করেছিল। এই আন্দোলনটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার দ্বারা চিহ্নিত ছিল এবং ভারতে পরবর্তীতে কৃষক বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত ছিল।

বাংলার রেনেসাঁ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ

19 শতকের বেঙ্গল রেনেসাঁ ছিল সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক সংস্কারের একটি সময় যা স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই যুগে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের উত্থান ঘটেছিল। বেঙ্গল রেনেসাঁ ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে, জাতীয় গর্ববোধ জাগিয়ে তুলতে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ছিল। রাজা রাম মোহন রায়, প্রায়শই আধুনিক ভারতের জনক হিসাবে বিবেচিত, সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সতীদাহ ও বাল্যবিবাহের মত প্রথার বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা, শিক্ষা ও নারীর অধিকারের প্রচারের প্রচেষ্টার সাথে রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

রেনেসাঁর প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছিলেন। ঠাকুরের কাজ ভারতীয় সংস্কৃতিকে উদযাপন করেছে এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নের সমালোচনা করেছে, একটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্নের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাংলায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ

যখন বঙ্গীয় রেনেসাঁ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা করেছিল, তখন এটি 20 শতকের প্রথম দিকে যা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাক্ষী ছিল। স্বদেশী আন্দোলন (1905-1911) এর আশেপাশে বাংলায় প্রথম সংগঠিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব ঘটে, যা 1905 সালে বাংলাকে বিভক্ত করার ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছিল। অনেকেই এই বিভাজনটিকে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার কৌশল হিসাবে দেখেছিলেন। অঙ্কুল

অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর পার্টি ছিল বাংলায় সক্রিয় বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। এই দলগুলোর লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করা। অরবিন্দ ঘোষ, রাশ বিহারী বসু, যতীন্দ্র নাথ মুখার্জি (বাঘা যতীন) এবং ক্ষুদিরাম বোসের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

ক্ষুদিরাম বোস, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ শহীদদের একজন, 1908 সালের মুজাফফরপুর বোমা হামলায় জড়িত থাকার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হলে জাতীয় বীর হয়ে ওঠেন। 18 বছর বয়সে তার মৃত্যুদন্ড ব্যাপক ক্ষোভকে অনুপ্রাণিত করে এবং সারা দেশে বিপ্লবীদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে।

স্বদেশী এবং আইন অমান্য আন্দোলন

1905 সালে বঙ্গভঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে বাংলায় একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এই বিভাজনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এটি ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং দেশীয় শিল্পের প্রচারের আহ্বান জানায়। বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, এবং অরবিন্দ ঘোষের মতো নেতারা স্বনির্ভরতা (স্বদেশী) এবং স্ব-শাসনের (স্বরাজ) পক্ষে পরামর্শ দিয়ে বাংলা এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

এই সময়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সরলা দেবী চৌধুরানী এবং বাসন্তী দেবী স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট নারীদের মধ্যে ছিলেন। এই প্রাথমিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রচারণায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল।

পরবর্তীকালে, মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক চালু করা আইন অমান্য আন্দোলনের (1930-1934) জন্য বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। চিত্তরঞ্জন দাস (সি.আর. দাস) এবং সুভাষ চন্দ্র বসু সহ অনেক বাংলা নেতা

এই আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। আইন অমান্য অভিযানের প্রতি বাংলার প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতা আন্দোলনে এই অঞ্চলের অব্যাহত কেন্দ্রীয়তা প্রদর্শন করে।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অন্যতম আইকনিক ব্যক্তিত্ব হলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থী পদক্ষেপের প্রবক্তা, বোস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) নেতৃত্ব এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন চাওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বাংলার অবদানের পালিত দিক। সুভাষ চন্দ্র বসু, নেতাজি নামে পরিচিত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ক্যারিশম্যাটিক এবং বিতর্কিত নেতা ছিলেন। 23শে জানুয়ারী, 1897 সালে, ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহণ করেন, বোস একটি সচ্ছল বাঙালি পরিবারে ছিলেন। একজন মেধাবী ছাত্র, তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস (ICS) করার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। যাইহোক, ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার গভীর আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত, বোস 1921 সালে আইসিএস থেকে পদত্যাগ করেন, ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন।

বোস তার দৃঢ় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার কারণে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের মতো নেতাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং তার সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জ্বলন্ত বক্তৃতার জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন। 1920 এবং 1930 এর দশক জুড়ে, বোস পূর্ণ স্বাধীনতার কারণকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, যা মহাত্মা গান্ধীর পক্ষপাতী ক্রমবাদী দৃষ্টিভঙ্গির চেয়েও বেশি কট্টরপন্থী অবস্থান। বসুর রাজনৈতিক মতাদর্শ আক্রমনাত্মক পদক্ষেপ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যা জিউসেপ্পে গ্যারিবাল্ডি এবং ভ্লাদিমির লেনিনের মতো নেতাদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল। 1938 সালে, বোস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু তার মেয়াদ গান্ধী এবং দলের মধ্যপন্থী দলগুলির সাথে আদর্শিক দ্বন্দ্ব দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। গান্ধী যখন ব্রিটিশদের সাথে অহিংসা ও আলোচনার পক্ষে ছিলেন, তখন বসু সশস্ত্র প্রতিরোধ সহ প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই মতাদর্শগত ফাটলটি 1939 সালে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে বসুর পদত্যাগের মধ্যে পরিণত হয়েছিল।

নিরুৎসাহিত, বোস বিদেশী শক্তির কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বিখ্যাতভাবে 1941 সালে গৃহবন্দিত্ব থেকে রক্ষা পান, জার্মানিতে পৌঁছানোর আগে আফগানিস্তান

এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য নাৎসি সমর্থন চেয়েছিলেন। পরে, তিনি জাপান-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যান, যেখানে তিনি ভারতীয় সৈন্য এবং প্রবাসীদের দ্বারা গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) কমান্ড নেন। "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব" স্লোগান দিয়ে বসু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিলেন। যদিও INA-এর সামরিক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল, বোসের কর্মকাণ্ড লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং তিনি সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে আছেন। 1945 সালে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তার রহস্যজনক মৃত্যু বিতর্ক এবং জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে আছে। একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে বোসের উত্তরাধিকার যিনি ভারতের স্বাধীনতাকে সর্বোপরি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তা দেশের সম্মিলিত স্মৃতিতে অনুরণিত হচ্ছে।

1941 সালে ব্রিটিশ নজরদারি থেকে বোসের বিখ্যাত পলায়ন, তার পরে ভারতের বাইরে থেকে একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে INA-এর প্রচারণার মাধ্যমে, আন্দোলনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত আইএনএ পরাজিত হয়েছিল, বোসের প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিরাম চেতনার প্রতীক এবং পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং এর বাইরে বাংলার ভূমিকা

1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ ছিল। এই আন্দোলনটি বাংলার সমাজের সকল অংশের ব্যাপক অংশগ্রহণের সাক্ষী ছিল, শহর ও গ্রামীণ উভয় জনগোষ্ঠীই ভারত থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাহারের আহ্বানে যোগ দিয়েছিল। 8ই আগস্ট, 1942 সালে শুরু হওয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ব্রিটিশ শাসন। আগস্ট আন্দোলন নামেও পরিচিত, এটি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসানের আহ্বান জানিয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত আহ্বানে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ লোককে একত্রিত করেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শিকড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নীতির প্রতি অসন্তোষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতীয় নেতাদের সাথে পরামর্শ না করেই ভারতকে যুদ্ধে জড়ানোর ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দেয়। ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 8 আগস্ট, 1942-এ কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাস করে। গান্ধী বিখ্যাতভাবে ভারতীয়দের স্বাধীনতার জন্য

তাদের অন্বেষণে "ডু অর ডাই" করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের জন্য।

আন্দোলনটি সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। ছাত্র, কৃষক, নারীসহ সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, স্বাধীনতার দাবি ব্যক্ত করে। বোম্বে, কলকাতা এবং দিল্লির মতো শহরগুলি ব্যাপক বিক্ষোভের সাক্ষী ছিল, যখন গ্রামীণ এলাকায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন দেখা গেছে। যাইহোক, ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া ছিল কঠোর এবং দমনমূলক। আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে, গান্ধী এবং কংগ্রেস দলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তার এবং নৃশংস দমন-পীড়ন সত্ত্বেও, আন্দোলনটি গতি লাভ করে, লোকেরা বিভিন্ন ধরনের আইন অমান্য করে। রেলপথ, টেলিযোগাযোগ লাইন এবং সরকারি ভবনের বিরুদ্ধে ব্যাপক নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনটি নতুন নেতা ও সংগঠনের উত্থানও দেখেছিল, যেমন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ), যার লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা।

যদিও ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, তবে এটি স্বাধীনতার সংগ্রামকে উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র করে তোলে এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করে। এই আন্দোলনটি ভারতীয়দের তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার দৃঢ়সংকল্পের উপর জোর দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মোড়কে চিহ্নিত করেছিল, যা ব্রিটিশ নেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির দিকে পরিচালিত করে যে ভারতকে তার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করা যাবে না।

আন্দোলনের শেষের দিকে, ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান অক্ষম, এবং এই ঘটনাটি 1947 সালে ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতার মঞ্চ তৈরি করে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতের নিরলস সাধনার প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে এবং তা প্রদর্শন করে। নিপীড়নের মুখে সম্মিলিত পদক্ষেপের শক্তি। উপরন্তু, 1943 সালের গ্রেট বেঙ্গল দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি ছিল, যা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ব্যর্থতা প্রকাশ করে এবং স্বাধীনতার দাবিকে তীব্র করে তোলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা এবং স্বাধীনতার জন্য এর চূড়ান্ত ধাক্কা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক গতি লাভ করে। বাংলা, ইতিমধ্যেই একটি মূল খেলোয়াড়, বিপ্লবী কর্ম এবং আইন অমান্য অভিযানের সংমিশ্রণের মাধ্যমে তার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।

যুদ্ধের পর, ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মির সৈন্যদের, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বাঙালি, ব্রিটিশ সরকার বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল। এটি ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয়, বিশেষ করে বাংলায়, যেখানে বোসের উত্তরাধিকার বড় আকার ধারণ করে। 1946 সালে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, যদিও একটি প্যান-ইন্ডিয়ান ইভেন্ট, বাংলা থেকে যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মোহ চরমে পৌঁছেছিল।

একই সাথে, বাংলার রাজনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে বিধান চন্দ্র রায় এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের প্রচেষ্টা স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত ধাক্কা দেয়। সোহরাওয়ার্দী, বিতর্কিত ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে (1946) এর সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও, ভারতের অংশ হিসাবে বাংলার উত্তরণ নিয়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যদিও প্রদেশটি শেষ পর্যন্ত বিভক্ত হবে।

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের অবদান অপরিসীম, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং বিপ্লবী উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আন্দোলনের গতিপথকে গভীরভাবে গঠন করেছিল। প্রারম্ভিক বিদ্রোহ

এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁ থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্ব পর্যন্ত, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা এই অঞ্চলের প্রতিরোধ, স্থিতিস্থাপকতা এবং জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রমাণ। বাংলার অবদানের উত্তরাধিকার সমসাময়িক ভারতকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে, যা জাতির স্বাধীনতার জন্য করা আত্মত্যাগের স্মারক হিসাবে কাজ করে।

References

1. Anand, S. (2015). Subhas Chandra Bose: The Springing Tiger. Penguin Books.
2. Chakrabarty, B. (2014). The Partition of Bengal and Assam, 1932–1947: Contour of Freedom. Routledge.
3. Mukherjee, S. (2004). Bengal in the Indian Nationalist Movement, 1912–1947: The Role of Mahatma Gandhi and Other Leaders. University of Calcutta Press.
4. Roy, T. (2007). Renaissance in Bengal: The Social and Intellectual Awakening in the 19th Century. Orient Blackswan.
5. Sarkar, S. (1989). The Swadeshi Movement in Bengal: 1903-1908. People's Publishing House.
6. Sarkar, T. (2012). Women and Social Reform in Modern India: A Reader. Indiana University Press
7. Tinker, H. (1968). Revolt in Bengal: 1942–1945. Heinemann.
8. Bose, S. (2003). His Majesty's Opponent: Subhas Chandra Bose and India’s Struggle against Empire. Harvard University Press.

9. Ghosh, B. (2000). The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore. Permanent Black.
10. Gupta, P. (2011). The Bengal Revolutionaries: A Story of the Bengal Volunteers. Rupa Publications.